বিশেষ ক্রোড়পত্র

জাতীয় শোক দিবস

বৃহস্পতিবার ১৫ আগস্ট ২০১৯

'মুছিবেনা চিহ্ন তার... (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু আমিতো দেখি আজ সমাধি থেকে জেগে ওঠা নতুন এক বঙ্গবন্ধুর বিশাল আবেদন। বাংলাদেশের মানচিত্রের সমানই যার অস্তিত্ব, চরিত্রহননের কোনো ছোরা দিয়ে তাঁকে কী নিধন করা হয়ে গেছে? অবমূল্যায়নের কোনো নরুন দিয়ে ছেদন করা গেছে কী স্বাধীনতার এই বটবৃক্ষকে? না, শত ষড়যন্ত্র আর হাজারো চেষ্টার পরও মুজিব মরেননি। শারীরিকভাবে হত হলেও বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে। শাসকরা তাঁকে ভুলিয়ে দিতে কত ছলাকলার আশ্রয় নিলো। কিন্তু মুজিব নামের সম্মোহন আজ সারাবাংলায় জাগিয়ে তুলেছে এক নবজাগরণের ঢেউ।

জনতার বিবেকের আদালতে মুজিব হত্যার বিচার শুরু হয়ে গেছে। বিচার শুরু হয়ে গেছে ইতিহাসের আদালতে। সেই আত্মস্বীকৃত খুনিরা শত আশ্রয়-প্রশ্রয়েও প্রটেকশন পায়নি জনতার কাছে। আদালতের রায়ে ফাঁসিতে ঝুলেছে খুনিরা। সারাদেশ জুড়ে জনগণের ধিক্কার আর ঘৃণাই আজ খুনিদের প্রাপ্য। যারা লুকিয়ে আছেন তাদেরও ফিরিয়ে আনা হবে; বাস্তবায়ন করা হবে রায়।

মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্য বাংলার ঘরে ঘরে অনুতাপ শুরু হয়ে গেছে। যেমন অনুতাপ হয়েছিলো এ বাংলায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার জন্য। জায়েরে আজও লুমুম্বা হত্যার অভিশাপে জর্জরিত। গ্রানাডার মাটি হজম করেনি মরিস বিশপের রক্ত, চিলি হজম করেনি আলেন্দের রক্ত। বাংলাদেশের মাটি কী হজম করতে পারবে মুজিবের রক্ত?

একদা নিথর নিস্তব্ধ অন্ধকার টুঙ্গিপাড়ায় এখন লাখো জনতার ঢল। জাতির পিতার জন্মোৎসবে দেখেছি অন্তহীন জনতার স্রোত। জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া অভিমুখে বঙ্গবন্ধুর শাহাদত দিবস উপলক্ষে এবারও গতবারের মতো বাংলাদেশের সব রাস্তাই মিলে যাচ্ছে টুঙ্গিপাড়ার সঙ্গে। শুধু কী জন্ম আর মৃত্যুদিবস? রোজ রোজ কত নরনারী ও শিশু ছুটে যায় শেখ মুজিবের সমাধিস্থলে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন টুঙ্গিপাড়া পরিণত হবে এই জনপদের সব বিবেকবান, হৃদয়বান ও দেশপ্রেমিক মানুষের পবিত্র তীর্থস্থানে। এইতো সেদিন বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সঙ্গে টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে জাতির পিতার জন্য অনুতপ্ত হাজার হাজার মানুষের অপরিসীম ভালবাসা আর অকৃত্রিম শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখে এসেছি।

বঙ্গবন্ধু, আপাতত আপনি এখানেই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকুন। ঘাতকের বুলেটের চেয়েও আপনি আজ আরও বলশালী। জাগ্রত জনতার হৃদয়ে রয়েছে আপনার জাতীয় মর্যাদার পাকা আসন। আপনি মরেও বেঁচে আছেন। যতদিন এ বাংলায় চন্দ্রসূর্য উদয় হবে, যতদিন এই জনপদে পাখির কলরব থাকবে, নদীর কলতান থাকবে, সাগরের গর্জন থাকবে, বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে দেশ থাকবে, ততদিন আপনিও বেঁচে থাকবেন। কবির ভাষায়:

'মুছিবেনা চিহ্ন তার শত যুগান্তরে, অনন্ত কালের মহাঅনন্ত প্লাবনে।'

বঙ্গবন্ধু ও শহিদ বুদ্ধিজীবী... (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা বার বার উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ড. সনজিদা খাতুনের নেতৃত্বে জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' এবং অনুষ্ঠান শেষে 'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি' গান দু'টি পরিবেশন করে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে দ্বিতীয় শহিদ স্মৃতিসৌধ স্থাপন করেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার জন্য শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ছিল গভীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে। কথা ছিল বঙ্গবন্ধু টিএসসি মিলনায়তনে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করবেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হবে। (উল্লেখ্য যে, বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি তখনও স্থাপিত হয়নি)। ১৫ আগস্টের ট্র্যাজেডির কারণে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রতিষ্ঠানটির যে চরম ত্যাগ স্বীকার তার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে যেতে পারেন নি। দেশ বিভাগের পর বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন কিন্তু ১৯৪৯ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের সুযোগ পাননি কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। প্রসঙ্গক্রমে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময় অনশনরত বঙ্গবন্ধুর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ভাষা আন্দোলনের নেতাদের সাথে যোগাযোগ, ঐতিহাসিক ছয়দফা ঘোষণার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক, অসহযোগ আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাথে তাঁর যোগাযোগ এবং স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বহুবার তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতার শত্রুদের বিশেষত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিক্ষকদের গাত্রদাহের কারণ হয়ে উঠেছিল। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার যে তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল তার একটি কারণ হয়ত বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগমনের তারিখ নির্দিষ্ট করা ছিল ১৫ আগস্ট। ফলে বঙ্গবন্ধু আর তাঁর প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে পরিদর্শন করতে পারলেন না এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে এ মহান বিদ্যাপীঠের যে ত্যাগ তার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে যেতে পারেননি। এটা শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম দুর্ভাগ্য। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব এই যে 'ডাকসুর' নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো' এই স্লোগানের মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্ত করে এনেছিল এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ এর উপস্থাপনায় বিশাল সমাবেশে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

লেখক:জাতীয় অধ্যাপক

সেই রাত্রির কল্পকাহিনী

নির্মলেন্দু গুণ

তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে,
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদী রঙ,
তারপর তোমার জন্মসহোদর ভাই, শেখ নাসের,
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্যবিবাহিতা পত্নী,
আমাদের নির্যাতিতা মা।

এরই ফাঁকে একসময় ঝরে গেছে তোমার বাড়ির
সেই গরবিনী কাজের মেয়েটি, বকুল।
এরই ফাঁকে একসময় প্রতিবাদে দেয়াল থেকে
খসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের দরবেশ-মার্কা ছবি।
এরই ফাঁকে একসময় সংবিধানের পাতা থেকে
মুছে গেছে দুটি স্তম্ভ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।
এরই ফাঁকে একসময় তোমার গৃহের প্রহরীদের মধ্যে
মরেছে দু'জন প্রতিবাদী,
কর্নেল* জামিল ও নাম না জানা এক তরুণ,
যারা জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

তুমি কামান আর মৃত্যর গর্জনে উঠে বসেছো বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছো চোখে,
লুঙ্গির ওপর সাদা ফিনফিনে ৭ই মার্চের পাঞ্জাবি,
মুখে কালো পাইপ, তারপর হেঁটে গেছো বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহগুলো তোমার কি তখন খুব অচেনা ঠেকেছিল?
তোমার রাসেল? তোমার প্রিয়তমা পত্নীর সেই গুলিবিদ্ধ গ্রীবা?
তোমার মেহেদী মাখা পুত্রবধূদের মুজিবাশ্রিত করতল?
রবীন্দ্রনাথের ভূলুণ্ঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছো,
বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে
মেখেছো কপালে; ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে
পৃথিবীর দেয়া মাটির ফোঁটার শেষ-তিলক, হায়!
তোমার পা একবারও টলে উঠলো না, চোখ কাঁপলো না।

তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়
বন্ধ করতে, কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের এক বেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।

তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে, বুক প্রসারিত করে কী আশ্চর্য
আহ্বান জানালে আমাদের।-- আর আমরা তখন?
আমরা তখন রুটিন মাফিক ট্রিগার টিপলাম।
তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার পাখির ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেলে বেহেশতের দিকে...।
তারপর ডেডস্টপ।

তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে, গড়াতে,
আমাদের চোখের সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে থামলো।
--কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামলো না।
সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দার মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দুর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্নেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।

---

* কবিতাটি পড়ে কর্নেল জামিলের স্ত্রী আমাকে জানিয়েছেন, মৃত্যুর কিছুদিন আগে কর্নেল জামিল ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করেছিলেন

রাহাত খান

শোকাবহ আগস্টের একটা দিনে তাঁর কথা লিখতে বসেছি। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই। আল্লাহ রহমানুর রহিমের কাছে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জনক, সর্বকালের সেরা বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। পাকিস্তান, নিক্সন-কিসিঞ্জারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যের লিবিয়া, ইজিপ্ট প্রমুখ কতিপয় দেশের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টে তিনি শহিদ হন। তাঁর পরিবার-পরিজনের অনেক সদস্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

কেন ঘটানো হয়েছিল পনেরো আগস্টের নৃশংস সেই হত্যাকাণ্ড? এই প্রশ্নের জবাব আর অবিদিত নয়। তবু সত্যের তাগিদে কথাগুলো বারবার বলতে হবে। পনেরো আগস্ট, বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার-পরিজনের হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকবাহিনী, পাকিস্তানি সামরিক ও সিভিল আমলাদের শোচনীয় পরাজয় ও ব্যর্থতার দায় মেটাতে। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করতে। ধীরক্রমে বাঙালির শৌর্য বীর্যের ইতিহাস মুছে দিয়ে আবার সেই পরাজিত পাকিস্তানের সাথে নিদেনপক্ষে কনফেডারেশন জাতীয় কোনো রাষ্ট্রীয় বন্ধনে বাংলাদেশকে যুক্ত করতে।

এই ষড়যন্ত্র ভাষা দিতেই একজন পাকিস্তানপন্থি সামরিক কর্মকর্তাকে করার চেষ্টা চলল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বানানোর। শোকাবহ পনেরো আগস্টকে শোকের বদলে উৎসবে পরিণত করতে দিনটি খলনায়িকার জন্মদিন বলে ঘোষণা দেওয়া হলো।

এই খলনায়িকার আরো তিনটি জন্মদিন সরকারিভাবে রেকর্ডভুক্ত হয়ে আছে। ইতিহাসে তিনিই একমাত্র একবারের বদলে চার চারবার পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন। জন্ম-সত্যের বিপক্ষে এমন মিথ্যাচার বোধ করি আর হয় না।

পাকিস্তানি চক্রের বাংলাদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে তারা না পেরেছেন বঙ্গবন্ধু'র নাম ও কীর্তি ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে, না পেরেছেন ইতিহাস বিকৃতির পথ ধরে বাংলাদেশকে পাকিস্তানিকরণে জয়ী হতে।

বরং ঘটেছে এর উল্টোটা। যতদিন যাচ্ছে বাংলাদেশে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ইমেজ আরো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিচ্ছে। রাজনীতির মহানায়কের মর্যাদা লাভ করছেন বঙ্গবন্ধুই, বর্তমান প্রজন্মের কাছে। দীর্ঘদেহী, মজবুত শরীর, পঞ্চান্ন বছরের জীবনে রাজনীতিতে আদর্শের সাথে কখনো আপস না করা, রাজনীতির অর্ধেকটা জীবনে অসংখ্যবার জেল-জুলুম বরণ করা, আদর্শের প্রশ্নে হার না মানা, মানুষকে ভালোবেসে মানুষের অধিকার রক্ষার রাজনীতিতে লিপ্ত থাকা এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বতো ভুলে যাওয়ার নয়। ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় আসা দলটি বঙ্গবন্ধুর কীর্তি-কাহিনি মুছে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তবে সত্যকে শত মিথ্যাচারেও মুছে দেওয়া যায় না। নায়ক ছিলেন এবং নায়ক থেকে গেছেন সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। খলনায়ক কিংবা খলনায়িকাদের বাংলাদেশ পাকিস্তানিকরণ কিংবা পনেরো আগস্ট উৎসবের দিনে পরিণত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখেনি কোনোদিন, দেখবেও না ভবিষ্যতে।

১৫ আগস্টের শোকাবহ ঘটনাকে উৎসবে রূপ দিতে যারা চেয়েছিল, যৌথ-বাহিনীর কাছে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের স্থানটি শিশুপার্ক করার নামে ঢাকা দিতে চেয়েছিল তারা মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের ভাষায় 'কাহার জন্ম, নির্ণয় ন জানি।' এমন জঘন্য মনোবৃত্তি তারা দেখিয়েছে পাকিস্তানকে খুশি করতেই। সত্যের খাতিরে বলতে হয় এই ইতিহাস বিকৃতি দিন পরিক্রমার ধারায় একটুও টেকেনি। বরং সময়ের হাতে মার খেয়েছে সেই বর্বর দেশটি। পঞ্চাশ বছরের কম সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনীতির সূচকে বাংলাদেশ বহু এগিয়ে পাকিস্তানের চেয়ে। পার্লামেন্টে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যখন দেশকে সুইজারল্যান্ড বানাবার প্রতিশ্রুতি দেন, তখন পার্লামেন্ট সদস্যদের কেউ কেউ সামরিক বাহিনীর কৃপায় প্রধানমন্ত্রী হওয়া ইমরান খানকে বলেন সুইজারল্যান্ড বানাবার দরকার নেই। পাকিস্তানকে বাংলাদেশ বানাবার চেষ্টা করুন। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নের মডেল একটি রাষ্ট্র, যেখানে ন্যায়বিচার, সুশাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা চালিয়ে, সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান বাহিনী গেরিলা যুদ্ধে, এম. আর আখতার মুকুলের ভাষায়, বাঙালিদের হাতে 'কেচকি' মার খেয়েছিল। এখন বাংলাদেশের তুলনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে থেকে এই সত্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করছে যে পরমাণু বোমার অধিকারী হলেই উন্নত রাষ্ট্র হওয়া যায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তাঁরই 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। একটানা তিন মেয়াদ ধরে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের আওতায় বাংলাদেশ ইতিহাস হতে যাওয়া একটি স্বর্ণযুগ পার করছে।

আর বাংলাদেশকে পাকিস্তানিকরণের খলনায়ক ও খলনায়িকা, তাদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল, তাদের রাজনৈতিক শক্তি ক্ষয় পেতে পেতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। জাতির পিতার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের হোতারা এখন চাপাবাজি চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যাওয়ার মুরোদ রাখে না। দল তো লণ্ডভণ্ড, নেতারা দ্বিধা সংশয়ে ভোগে। প্রকৃতি আগস্ট হত্যাকাণ্ড এবং রাজনীতির নামে গ্রেনেডবাজির উচ্চমূল্য আদায় করছে এই দল, মিত্র দল ও দলসমূহের শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দূরদর্শী ও সাহসী নেতা ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিলেন। কারণ একটাই, পাকিস্তান হলে মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পাবে, খেতে পরতে পাবে, দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই পাকিস্তানিদের (তখনকার পশ্চিম পাকিস্তান) হাবভাব, আচারআচরণ, কার্যকলাপ দেখে তিনি বুঝতে পারেন বাংলাদেশকে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) তারা নিছক তাদের একটা মার্কেট এবং বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানাতে চায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশকে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) তারা শুধু যে অবজ্ঞার চোখে দেখে তাই নয়, বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার নব্বই শতাংশ তারা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। এই উপলব্ধি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আরো বহু নেতার চোখে ধরা দিয়েছিল। তারা বাঙালিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। এই পটভূমিকায় গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। বঙ্গবন্ধু তখন জেলে। তবে মুসলিম লীগ বিরোধী, প্রতিবাদী দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা জানতেন সাংগঠনিক শক্তির প্রশ্নে মুজিবের কোনো বিকল্প হয় না। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম কমিটিতে তাই জেলে থাকা তরুণ শেখ মুজিবকে দলের যুগ্ম সম্পাদক পদে স্থান দেন। বস্তুতঃ সাংগঠনিক শক্তি ও সাহসের জোরেই বঙ্গবন্ধু ক্রমে ক্রমে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন। 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'- বাঙালির কণ্ঠে এই স্লোগান ইতিহাসে আর কোনো বাঙালি নেতার নামে ধ্বনিত হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করে বঙ্গবন্ধু অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যেন বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম করতেই জন্মেছিলেন। তাঁর জন্ম মর্যাদাপূর্ণ একটি প্রাচীন বংশে। তবে সাধারণ মানুষই ছিল তাঁর রাজনীতির প্রেরণা। বাংলার মানুষকে এতোটা ভালোবাসা তাঁর মতো আর কেউ দেননি। পাকিস্তানি শাসকদের সাথে সামান্য খানিকটা আপস করলেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু বাঙালির প্রতি বেইমানি করার মনোবৃত্তি বঙ্গবন্ধুর ছিল না কখনোই। তিনি বাঙালির হাজার বছরের সেরা নেতা হয়েছেন বাংলাদেশ ও বাঙালিকে ভালোবেসেই। বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এই ধ্রুপদী উচ্চারণ শুধু তাঁকেই সাজে।

বঙ্গবন্ধুকে প্রথম চাক্ষুস দেখি ১৯৬৪ সালের শেষ দিককার কোনো একটা দিনে, ময়মনসিংহ শহরে। আমি সেই শহরের বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনা করছি। লেখালেখির নেশাটা তখন আমার বৈষয়িক সব ইচ্ছাকে ছাড়িয়ে গেছে। ঢাকা-রাজশাহী ট্রেনে খবরের কাগজ এবং পত্রপত্রিকা পাওয়া যেত দুপুরের দিকটায়। ট্রেন আসছে, সেই অপেক্ষায় এক নম্বর প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সোজাসুজি তাকিয়ে প্রায় অলৌকিক একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। দেখলাম শাল-প্রাংশু দেহের অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমান ও আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ সাহেব দুই নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে সিঁড়ি বেয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফরমের দিকে আসছেন। পিছনে মধ্যাহ্নের সূর্য।

আমার কাছে দৃশ্যটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল সূর্য পিছনে ফেলে যিনি আসছেন, তিনি রাজনীতিতে শুধু টিকবেন তা নয়, তিনি বাঙালির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। রাজনীতিতে আমার খুব একটা উৎসাহ ছিলনা। কীইবা জানতাম রাজনীতি সম্পর্কে! তবে রাজনীতি না জেনেও বঙ্গবন্ধুকে দেখে কথাটা আমার মনে হয়েছিল। ছয়দফা আন্দোলনের সময় জগন্নাথ কলেজের এন.ইউ. আহমদের রেস্টুরেন্টে মাঝে মাঝে আসতেন। সঙ্গে বেশির ভাগ সময় থাকতেন ন্যাপ প্রেসিডেন্ট কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ। জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক সাইদুর রহমান বঙ্গবন্ধুকে পছন্দ করতেন। আমরা দু'চারজন কনিষ্ঠ অধ্যাপক ঐ ক্যান্টিনেই বঙ্গবন্ধুর সাথে পরিচিত হই।

ইত্তেফাকে যোগ দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়। রাতে বাসায় ফেরার সময় পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগের অফিসে মাঝে মধ্যে যেতাম। বঙ্গবন্ধুর চারপাশে লোকজন গমগম করত। আরো পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেশ কয়েকবার ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে গেছি কখনো একা, কখনো ড. মাযহারুল ইসলাম, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সাথে। বঙ্গবন্ধু প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিলেন। তার মলিন মুখ কখনো দেখিনি। তিনি ছিলেন ২৪ ঘণ্টার রাজনীতিবিদ।

বঙ্গবন্ধু শিশুকাল থেকেই মানুষকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসার এবং নেতৃত্বদানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। নিজের গায়ের জামা, চাদর, ছাতা, ইত্যাদি দরিদ্র বন্ধু বা অভাবগ্রস্ত শিশুদের বিলিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরতেন। ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন তিনি। তাঁর যে নেতৃত্ব দানের কোনো আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাশা থাকত তা মোটেও নয়। তিনি সমবয়সি বন্ধু ও পরিচিতজনদের ভালোবেসে সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু এমন যিনি হৃদয়বান, এমন যিনি সবাইকে ভালোবাসতে জানেন, তাকে অন্যরাই নেতা হিসাবে বরণ করে নিতেন। বাল্য ও কৈশোরে এভাবেই বঙ্গবন্ধু সহজাত নেতৃত্বগুণ আয়ত্ত করেছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ প্রতিকার, অন্যায়ের প্রতিবিধানে সকলের আগে এগিয়ে যাওয়া, প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালী হোক, তাদের রুখে দাঁড়ানো, কিশোর শেখ মুজিবের জন্য কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম ছিল না। তার মানুষকে ভালোবাসার অন্তঃকরণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া, যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় দুরন্ত সাহসের পরিচয় দেওয়া এইসব প্রকৃতিগত গুণাবলীই তাকে বৃহত্তর কর্মজীবনে রাজনীতির পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। রাজনীতি তাঁর ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়েছিল। তবে এই রাজনীতি রাজা-গজা হওয়ার রাজনীতি ছিল না, এই রাজনীতি ছিল সাধারণ মানুষকে ভালোবেসে তাদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের ভাগ্যোন্নয়নের রাজনীতি।

পেছনে তাকালে রাজনীতির ইতিহাসে যে মহীরুহ; বটবৃক্ষ, তিনিই তো বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গণমানুষের জন্য অগাধ ভালোবাসা তাঁকে রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে। সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রেরণাও পেয়েছেন তিনি তাঁর প্রতি গণমানুষের ভালোবাসা এবং সমর্থনের জোরে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতির সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন। তাঁর রাজনীতি গণমানুষের প্রতি ভালোবাসা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সাহসের অধিক সাহসের গল্প বৈ আর কিছু নয়। ❑

আঁধারে আলোর আঁখি

তারিক সুজাত

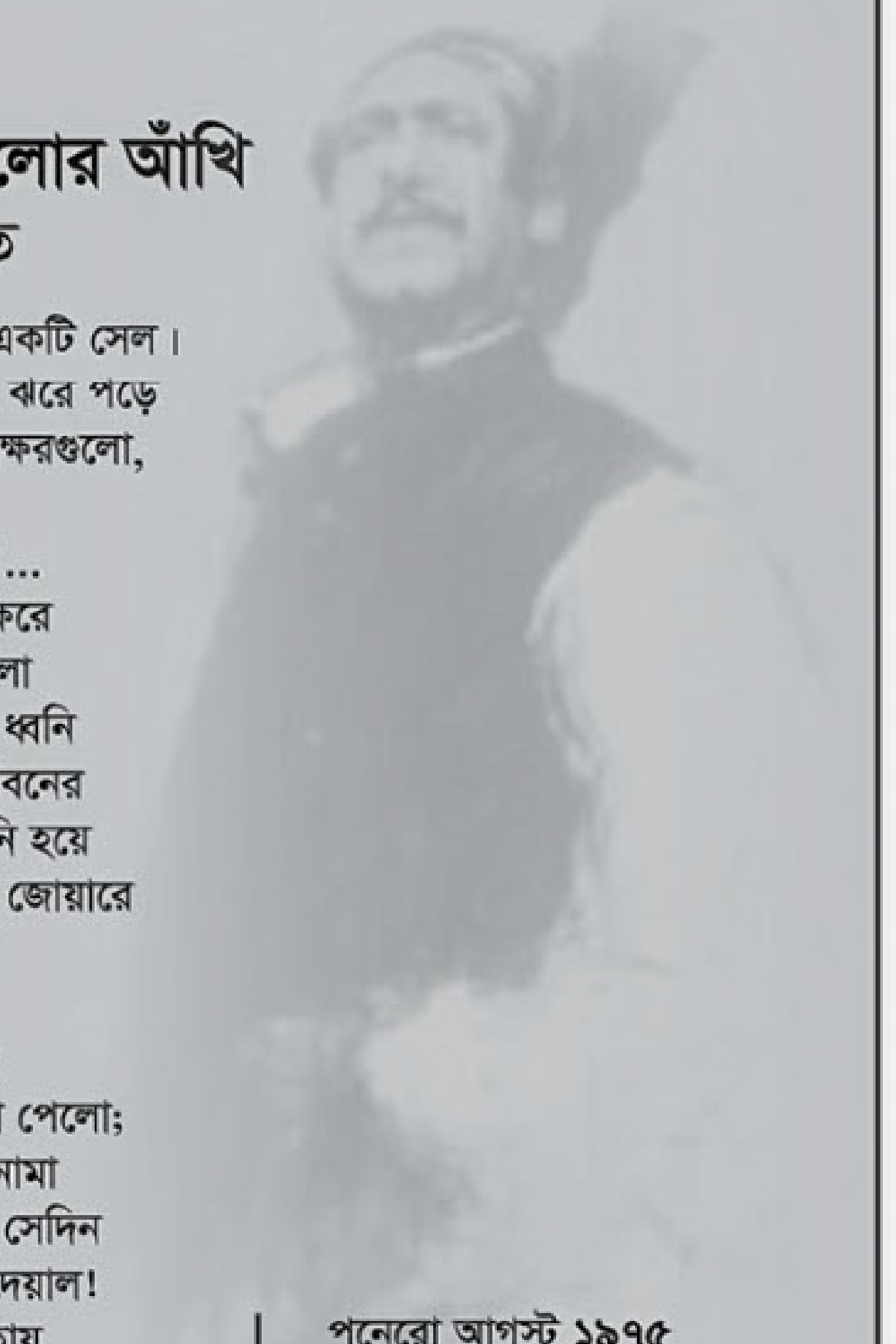

প্রায়ান্ধকার নির্জন একটি সেল।
কলমের নিব থেকে ঝরে পড়ে
রাতজাগা কালো অক্ষরগুলো,
ফুটছে সকাল
জীবন জয়ের কাব্য ...
সাদামাটা সরল অক্ষরে
বাইগার নদীর সুরেলা
কলকল ধ্বনি
শৈশব-কৈশোর-যৌবনের
প্রতিধ্বনি হয়ে
ঢেউ তোলে স্মৃতির জোয়ারে
কী ছায়া কী মায়ায়
জনক তোমার
কল্লোলিত জীবনের
অসমাপ্ত গান পূর্ণতা পেলো;
একটি জাতির জন্মনামা
কান পেতে শুনেছে সেদিন
কারাগারের বিষণ্ন দেয়াল!
সাদা পৃষ্ঠার নির্জনতায়
কুয়াশায় লেখো ভোর
রাত্রিকেও তুমি
রোপণ করেছো মনে
হে পিতা!
নিয়েছিলে তুমি
হৃদয়ে তোমার সন্ধ্যা প্রদীপ শিখা
নিয়েছিলে রোদ
আঁধারে আলোর আঁখি
ইতিহাস পেলো পথ ...

দিন যায় বছর ফুরায়
দিন আসে আগুনের পথ ধরে
ক্যালেন্ডারের পাতায় পাতায়
একেকটি দিন গর্জে ওঠে
জ্বলজ্বলে রক্তাক্ত অক্ষরে
১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৪,
১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬,
১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০,
১৯৭১
অতঃপর
একটি আঙুলে
জড়ো হয়েছিলো সারাদেশ!
রক্ত-নদীর স্রোতে
লেখা হলো
ত্রিশ লক্ষ শহিদের
অমেয় আখ্যান– স্বা ধী ন তা!

পনেরো আগস্ট ১৯৭৫
জতুগৃহে
পিশাচের উল্লাসধ্বনি
শুনেছে নিষ্প্রাণ প্রাণ
ঘাতকের বর্বর বুলেটে
বিদ্ধ বাংলাদেশ–
রক্তধারায় ভাসে
স্বজনের লাশ!

পিতৃহত্যার দায় নিয়ে
একদা বীরের জাতি
ব্যথায় বিহ্বল ভাসে
শোকের সাগরে!
এরপর
ইতিহাস বদলের ইতিহাস
ইতিহাস দখলের ইতিহাস।

জনক তোমার
দুহিতার হাত ধরে
ইতিহাস পেলো ভাষা
খুঁজে পেলো পথ,
পদচিহ্ন, মুক্তি, ভালোবাসা।
জনক তোমার
জন্ম-শতবর্ষের অমল আলোয়
প্রাণ খুলে উড়ি পতাকায়
আগামী আগস্ট
এই আগস্টকেও বলে যায়
মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়েও তুমি
বলে গেছো প্রতিবাদে–
'জীবনে দু'বার কেউ মরবো না'
জীবনের জয়গানে
মুখরিত হবে
আমার স্বদেশ
আমার জন্মভূমি!